আঁধার পেরিয়ে

দেবাশিস মজুমদার

১

যে বালক কোনও এক নির্জন দুপুরে রাঙতার মুকুট আর একটুকরো পরিত্যক্ত ভাঙা লাঠিকেই তলোয়ার বানিয়ে রাজ-সাজে আপনমনে সংলাপ আবৃত্তি করতে থাকে—তার চারিপাশের বল্গাহীন স্বপ্ন যে কতদূরে সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ নিশানটা পুঁতে আসে তার সঠিক পরিমাপ কেউ জানে না। এই শব্দহীন অধিকার প্রতিষ্ঠায় কারও সঙ্গে কোনও যুদ্ধ নেই, হত্যা কিংবা রক্তপাত নেই। শুধু খুশির হাওয়ায় কল্পনার পালতোলা ডিঙা এক তীর থেকে আর এক তীরের দিকে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায়, কিন্তু তারপর……? তারপর, যেতে যেতে যেতে নদী একদিন মোহানার দেখা পায়, আর হাতের মুঠিতে ধরা টাটকা ফুল বাসি হয়ে যায়। তখন শিল্পের কারিগর হিসাবে সেদিনের বালক পরিণত পুরুষ-মননে সীমাহীন উধাও প্রান্তে আর অনায়াসে নিশান পুঁতে আসতে পারে না। এখন, চারিপাশের রুখাশুখা জমিনে তাকে প্রতিদিন, প্রতিটি নির্মাণের আবাহন কাল থেকে সমাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্ত—স্বপ্নের সব রঙ, সব রেখা, শব্দের সকল কম্পন নিঃশেষিত করে রাঙতার মুকুট আর ভাঙা লাঠির তলোয়ারকে এক শৈল্পিক সত্যে পৌঁছে দেবার পরিশ্রমে প্রণত থাকতে হয়। এখানে, বিশেষত নাট্যের ভুবনে কোনও নির্জন দুপুর নেই, আছে শুধু এক টুকরো ফাঁকা জমি আর দুই থেকে সহস্রাধিক তৃষ্ণার্ত চোখ। যাদের প্রদেয় ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সৃষ্টির পূর্ণতা নেই। এখানে সাফল্যের উল্লাস পলকের মধ্যে স্বর্গারোহণের পথ আলোকিত করে দেয়, আবার ব্যর্থতার হাহাকার একাকী বহন করে ফিরে যেতে হয় অন্ধকারে। তখন সে ভাবতে বসে, কেমন করে, কার জন্যে সে কাজ করবে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানা পর্যন্ত সে কাজ শুরু করতে পারে না। আত্মভাবনার কর্মশালায় যে সৃষ্টিকে সে শ্রেষ্ঠত্বের মান দিয়েছে তার সার্থক রূপায়ণের চেষ্টায় শুরু হয় পথ খোঁজা। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু তার নির্মাণ আকাঙ্ক্ষা আর হাজার দৃষ্টির স্বীকৃতির প্রার্থনায়।

এই দ্বন্দ্বের কারণেই একে-একে বন্ধ দুয়ার খুলতে থাকে। প্রতিমুহূর্তে তাকে জানতে হয় নিজেকে আর নিজের বাইরেটাকে। আর জানবার সেই ঝোড়ো হাওয়ায় ভেঙে যায়, অচেনা দূরে হারিয়ে যায় নির্মাণের সকল মাপ, সকল হিসাব। তখন সে নতুন অভিজ্ঞতায়—ঐতিহ্যের প্রজ্ঞায় আবার শুরু করে। কিন্তু তাকেও আবার ভাঙতে হয় বেঁচে থাকবার তাগিদে। শুধুমাত্র শিল্পীর গভীরে নয়, শিল্পের বিস্তারেও এই

তত্ত্বের স্বীকৃতি আছে। যেমন এক পশ্চিমী সাহেব লিখেছেন : থিয়েটার কী ? এই মুহূর্তে যা হচ্ছে তা নয়, যা হয়েছিল বা হয়েছে তা নয়, এমনকি যা হবার কথা ভাবা হচ্ছে তাও নয়। অর্থাৎ শেষ সীমারেখা বলে কিছু থাকতে পারে না। তাকে বাঁধা যাবে না সঙ্কীর্ণগণ্ডির নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়। প্রতিনিয়ত সে ভাঙবে এবং গড়ে উঠবে তারই মধ্যে। যে কোনও দেশের ঐতিহ্যের আপাত রূপের মতো। একজন কারিগরকে হাজার-হাজার বছরের ঐতিহ্যের পরম্পরায় অভিষিক্ত হতে হয় আবার সেই ঐতিহ্যকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন হয়ে ওঠবার মধ্যে যেমন শৈল্পিক পরমাণু বেড়ে যায়, তেমনই ঐতিহ্যেরও আসে নবায়ন। অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে ভাঙতে-ভাঙতে গড়তে হবে, আবার তাকেও ভেঙে ক্রমশ প্রবাহিত নির্মাণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন বলেছেন সেই চৈনিক দার্শনিক, প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব এবং তার মীমাংসার মধ্যে সঠিক উত্তরণ। আবার সেখানেই শুরু হয় আর এক নতুন দ্বন্দ্ব। কোনওদিন এই ছন্দ হারালেই মৃত্যু, না হলে ফুটে ওঠে জীবনের শত ফুল। পাকাচুলের গুটিকয়েক মানুষ মাথা নেড়ে বলবেন, 'ঠিক কথা। একেবারে হক কথাটি ভেবেছো হে। থিয়েটারে দ্বন্দ্বের বড় দরকার, যাকে বলে সঙ্ঘাত, ঘটনার আর চরিত্রের সঙ্ঘাত। পৃথিবীর সকল ভাল থিয়েটারেই তার দেখা পাওয়া যায়। সে তোমার ধ্রুপদী সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। এইটে না বুঝলেই তুমি, বেনো জলে ভেসে হবে কালিদহ পার।' সন্দেহ নেই সম্পূর্ণ ভুল এই ধারণা। কারণ, তাহলে থিয়েটারের ঘাড়ে চাপাতে হয় সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার দায়। আসলে জানতে হয় যে সময় ও সমাজে আমার থিয়েটার করা বা দেখা তার প্রধান দ্বন্দ্বগুলি কী কী, কোনটি প্রধান বা মুখ্য ? কে এগিয়ে যাবার পক্ষে আর কোনটিই বা বিপরীতগামী শক্তি ? শিল্পে তথা নাট্যে যে মুহূর্তে তার সঠিক প্রতিফলন ঘটে তখনই সে হয়ে ওঠে আধুনিক। হাজার হাজার বছর আগে একাকী মানুষ কিংবা মানুষের দল হিংস্র উল্লাসে, অথবা অলঙ্কার-হীন যন্ত্রণার তীব্র ঝোঁকে গুহার পাথরে—রেখার টানে বেঁধে রেখেছিল একদল পশু। হয়ত-বা সেই পশু শিকারের আকাঙ্ক্ষায়, অলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুশাসনে অর্জিত-শরীর আর অস্ফুট শব্দের উচ্চারণে তৈরি হয়েছিল অনুষ্ঠানিক নৃত্য, মুহূর্তের বিন্যাসে অসংযত নাট্য। মানুষের ইতিহাস আমাদের শেখায়, জীবনধারার সেই ঊষা লগ্নে মুখ্যত যে দুটি দ্বন্দ্বের প্রাধান্য ছিল তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায় ওই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকর্মের গভীরে। অর্থাৎ মানুষের বেঁচে থাকবার উপাদান সংগ্রহের উপায় বা কৌশল যেহেতু প্রাথমিক স্তরে শুধুমাত্র সমাজকে সংগঠিত করেছে তাই নয়, বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে বদলও করেছে। এবং সমাজস্রোতের এই বিভিন্নতা বিধৃত হয়ে আছে সেই সময়কার শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ও বৈভবেও। আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীটা একটি সত্য খুব স্থিরভাবে নির্দিষ্ট করেছে, যে শিল্পী 'সামাজিক' নয় তার শিল্প তথা সৃষ্টিকে ইতিহাস কখনও আদর দেয় না। তা সে যে সমাজব্যবস্থাই হোক না কেন। এই সত্য এড়িয়ে যে কেউ সাময়িকভাবে যত বিচিত্র মুখোশ ব্যবহার করুক না কেন, সময়ের দুরন্ত হাওয়ায় তা বিবর্ণ হতে বাধ্য। অশ্বিনী বাউলের ভাষায়, 'ওরেমন, সংসারেতে ডুব না

দিলে, মানুষ চিনবি কেমন কোরে ? / মাটি ছেনে তুই যে ঘর গড়িস, তোকেই সে ঘর নিত্য গড়ে।' এখন প্রশ্ন হল 'সামাজিক' বলতে আমরা কী বুঝি ?

২

থিয়েটারে নানা আয়োজন করবার পরেও এক বা একাধিক মানুষ, অপর প্রান্তের এক বা একাধিক মানুষের সামনে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সৃষ্টি হিসাবে সম্পূর্ণ হয় না। মানুষকে মানুষের সামনে কিছু করতে হয়। নাট্যকলার সৃষ্টিজগতে 'এর' বিকল্প ব্যবস্থার আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ একজন দর্শক যখন প্রেক্ষাসনে বসে নাটকটি দেখেন তিনি যেমন তার প্রতিমুহূর্তের অনুভূতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না, আবার সমভাবে সেই দর্শকের নাট্যদর্শনের হাজার প্রস্তুতি থাকলেও তার প্রতিটি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মিশে থাকে সামাজিক অবস্থান ও তার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা বোধ। অর্থাৎ সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় দৈনন্দিনতার রকমফেরের প্রভাবকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্য যে কোনও শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা নেই। একজন মানুষ তার বেঁচে থাকবার সময়কালের মধ্যে নানাভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে সাহিত্য পাঠে, চিত্র প্রদর্শনে, চলচ্চিত্র কিংবা সঙ্গীত শ্রবণে। থিয়েটারে সে সুযোগ নেই। কারণ নাট্যের সৃষ্টি এবং লয়-এর মধ্যে সময়কাল কয়েক পলক মাত্র। প্রেক্ষকের দ্বিতীয়বার উপভোগের কোনও সুযোগ থাকে না। আর একদিকে, মঞ্চে আমাদের যত-উপকরণ উপস্থাপিত করা হোক, আলো কিংবা ধ্বনির কৌশল করা হোক, শেষ পর্যন্ত একজন অভিনেতা হিসাবে একজন মানুষকেই এসে দাঁড়াতে হয়। যতই আমরা বিমূর্ততা অথবা রূপকের আশ্রয় করি না কেন, কোনওদিন হয়ত দালির স্বপ্নের কাঁটাহীন ঘড়িও টেবিলে বা বিছানায় বিছিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু পিকাসো অথবা গণেশ পাইনের বিশেষ শারীরিক উপস্থাপন ঘটানো কখনও সম্ভব নয়। একজন অভিনেতা, একজন মানুষ যখন মঞ্চে দাঁড়ায় তখন এক আকাড়া বাস্তবের টান থাকে তার মধ্যে, তাকে স্বীকার করে নিয়েই অভিনেতাকে পৌঁছতে বা প্রেক্ষককে পৌঁছে দিতে হয় অতি বাস্তবের কল্প-লোকে। আর কোনও শিল্পেরই প্রায় এই দায় নেই। আধুনিক পৃথিবী প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের উত্তাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সেই সমস্ত শিল্প মাধ্যমকে যুক্ত করে পৌঁছতে চাইছে অতিপ্রাকৃত এক যাদুকরের দরজায়। তার সেই এগিয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে যে পৌঁছতে পারছে না—সেই মাধ্যমকেই সরে যেতে হচ্ছে দূর থেকে আরও দূরে। পারিপার্শ্বিক এই আবহাওয়ায় সাবেক থিয়েটার তার সাম্প্রতিক অবস্থানের অমীমাংসিত দ্বন্দ্বে ছটফট করছে।

গ্যালিলিও যে বাতাবরণে এই পৃথিবীর অবস্থান ও গতিময়তার ব্যাখ্যা করেছিলেন তার অনুরণন একদিকে যেমন এই শতাব্দীর মধ্যভাগে হিরোশিমায় এসে ধাক্কা খেয়েছিল, আবার বিপরীতে তা পড়েছে হকিং-এর মহাজাগতিক বিস্তারে। তবু আজও সভ্যমানুষ সে বিজ্ঞানের যথার্থ সামাজিক অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে পারেনি। প্রযুক্তি

বিজ্ঞান আমাদের দেশে যতটাই বীর-সম্মানে পূজিত, ঠিক ততটাই বোধহয় অবহেলায় আচ্ছন্ন। শহর এবং শহরকেন্দ্রিক জীবনকে সে প্রতি পলকে বাঁধতে চাইছে, সম্পূর্ণভাবে না পারলেও সেই লোভের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার ভাল-মন্দের বিচার এখানে নয়। কিন্তু, পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি অনাগরিক বেঁচে থাকার মধ্যে কী ভয়ানক অবহেলা ছড়ানো আছে! পশ্চিমবঙ্গে দু-একটি গ্রাম অনুসন্ধানে এই সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল, উড়িষ্যা, বিহার বা হিমাচল প্রদেশের প্রত্যন্তের পরিচয়ে আমার এই ধারণা। চন্দ্রগিরির পথ পার করে এক জনবসতির মাঝে দাঁড়িয়ে হাজার অনুরোধেও কাউকে কথা বলাতে পারিনি, তার কারণ, সেই সব মানুষগুলোর মনে হয়েছিল আমি চোখের মধ্যে যে 'দর্পণ' লাগিয়েছি তা আসলে অলৌকিক শক্তি বিস্তারের উপাদান। চোখ থেকে চশমা ফেলে দেবার পর আতিথ্য পেয়েছিলাম। সন্দেহ নেই এই অসম বিকাশের পরিপূর্ণ দায় আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের, যাঁদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণ-ভাবে অবৈজ্ঞানিক।

যাই হোক, দেশের একাংশে বিজ্ঞানের আধুনিক বৈভবের উজ্জ্বলতা আর বাকি অংশের অজ্ঞানতাকে মেনে নিয়ে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির জাতীয় সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। তবে মস্ত সুবিধে হল এই, আমাদেরও সকল সমন্বয় শহর, খুব বেশি হলে মফস্বল-কেন্দ্রিক। সেই কারণেই বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমগুলিও বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝা-পড়া সেভাবেই করছে। কোনোওদিন যদি শব্দ-বিজ্ঞান সুরে বা সঙ্গীতকে সেইভাবে উপস্থিত করতে পারে যা আমি একজন শিল্পীর সামনে চোখ বন্ধ করে শুনতে পাই, বা দূরদর্শন, ভিডিও পর্দার পার্থক্য ঘটাতে পারে এবং রঙের সামান্যতম বিকৃতি না ঘটিয়ে চিত্রকরের সৃষ্টিকে উপস্থিত করে, তবে ক-জন আর দৌড়ে অনুষ্ঠান বা প্রদর্শনীতে যাবে? বিজ্ঞান এমনই এক ভয়ঙ্কর সময়ের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন কোনও আবিষ্কারে, চলচ্চিত্র যেভাবে প্রভাবিত হয়, নতুন হয়ে ওঠে— থিয়েটারের সে অবকাশ নেই। তাহলে পৃথিবী কি থিয়েটারের প্রতি সাদা রুমাল নাড়াতে শুরু করেছে?

পণ্ডিতরা মনে করেন 'সমাজ মানসের কেন্দ্র' অনুসন্ধান এবং তার সমকালীনতায় উপস্থাপন সব থেকে বেশি জরুরি। অবশ্যই এটা কোনও সাফল্য লাভের উপকারী বটিকা নয়। কারণ সমাজের যথার্থ 'মানস কেন্দ্রের' অনুসন্ধান বিষয়ক সিদ্ধান্তই তো পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আমি আগেই লিখেছি, শিল্পীকে 'সামাজিক' হতে হবে। মুশকিল হচ্ছে, অনেকেই ধরে নেন 'সামাজিক' হবার প্রকৃত উপায় বা পরিপূর্ণ অর্থ হচ্ছে তাকে খুব ভালভাবে রাজনৈতিক দর্শনকে জানতে হবে। বিপদ হয় এইখানে। বেশ কিছু মানুষ মানতেই চান না যে যথার্থ সমাজ মানসের বোধ কোথাও রাজনীতির থেকে ছোট নয় বরং বড়। আমাদের দেশেই তার হাজারো প্রমাণ দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। একজন শিল্পীকে এই অনুসন্ধানে ব্রতী হতে হয় সমাজেরই নানান পথ বেয়ে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষ পদ্ধতিতে। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে জানতে হয়, এই

জানার মধ্যে কোনও মিথ্যার স্থান নেই—তা সে যে কোনও শিল্পের ক্ষেত্রেই সত্য। বিশেষত থিয়েটারে একজন মানুষ (অভিনেতা) যখন অপর এক মানুষের সামনে কোনও চরিত্রের সংলাপ উচ্চারণ করে তখন 'তুমি ভাল না খারাপ অভিনয় করেছো সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না ; গুরুত্বপূর্ণ হলো অভিনয়ে সত্যাশ্রয়ী ছিলে কি না।' আমাদের সমকালীনতায় এই সত্যদর্শনের সিদ্ধান্ত বোধহয় খানিকটা পাতি সার্বিক ভাবনা, আর বাকিটা অবাস্তব বলে মনে হয়।

নাট্যপ্রেক্ষিতেও এই সমাজ-বাস্তবতায় আমরা একটি আপাত বিরোধ দেখতে পাই। তা হল এই যে, থিয়েটার একদিকে যেমন বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের 'সংযুক্ত শিল্প' আবার এই থিয়েটার কখনও একা-একা হয় না। এমনকি একজন দর্শক আর একজন মাত্র অভিনেতার সংযোগেও তার মুক্তির আকাশের যথার্থ সন্ধান পাওয়া ভার। বহুর সম্মেলনেই এই মাধ্যমটির সৃষ্টির আরাম। অথচ সারা দুনিয়ায় রাষ্ট্রিক ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাই আজ অন্যতম আধুনিক প্রবণতা হিসেবে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত আমাদের প্রায়শই একটি প্রশ্ন শুনতে হয়, 'কী হে, দল-টল ঠিক আছে তো, না আবার ভেঙেছে ? থিয়েটারের দলগুলোর যা অবস্থা !' আসলে প্রশ্নকর্তা সেই মুহূর্তে ভুলে যাবার চেষ্টা করেন তাঁর জানা-চেনা ব্যক্তি থেকে পরিবার, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক প্রতিকূলতার কথা। বিশেষত আমাদের মতো নাট্য দলগুলি কোনও খোলা বা বন্ধ বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—যেমন অন্যান্য দু-একটি শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। থিয়েটারের যৌথ কর্মকাণ্ড শুধু কয়েক ঘণ্টার অভিনয়ের মধ্যেই শেষ হয় না। প্রস্তুতির সূচনা ঘটে তারও বেশ কয়েক মাস আগে। থিয়েটার বোধহয় একমাত্র মাধ্যম যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাবি করে একাধিক মানুষের দীর্ঘকালীন মানসিক সংযোগ, যার ব্যতিরেকে কোনও নির্মাণে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। আজ প্রযুক্তিবিদ্যা আর বিকৃত রাজনীতির উৎকট দ্বন্দ্বে ব্যক্তি যৌথ মননের ভাবনাকে ছুঁতে পারে না। আত্ম-কেন্দ্রিকতার চোরা বালিতে দাঁড়িয়ে সে পণ্য অর্থনীতিতে নিজেকে বড় করে দেখতে শুরু করে। ফলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, সাময়িক ধাক্কা খায় থিয়েটার। শুধু দল ভাঙা নয়, দলের মধ্যে থেকেও এই বোধ অন্ধকার গর্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আবার প্রশ্ন জাগে এই অপরাহ্নিক আঁধারে তবে কি 'নাট্যকলা' শেষ হয়ে যাবে ?

৪

শেষ হয়ে যাবে ? বোধহয় না। তারও কারণ আবার সেই সমাজ এবং মানুষ। আগেই বলেছি থিয়েটারই বোধহয় একমাত্র শিল্প মাধ্যম যেখানে সৃষ্টি-মুহূর্তে স্রষ্টা এবং ভোক্তা উভয়কেই সক্রিয় থাকতে হয়।

বিজ্ঞান শেখায় মানুষের কোনও বিকল্প নেই। মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষকেই চায়। সেই চাওয়া, কিছু ঘৃণ্য কাজ বাদ দিয়ে, কখনওই শুধুমাত্র রক্তমাংসকে চাওয়া নয়। মানুষ অর্থাৎ অবস্থানগত সবটুকু নিয়েই তাকে পেতে চায়। যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবী এই আকাঙ্ক্ষাবোধকে মুছে দিতে পারছে—ততদিন মানুষের সামনে মানুষের থিয়েটার বেঁচে থাকবেই। □